নিখোঁজ মরদেহ উদ্ধার হওয়া সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের শেষ বার্তা- কি লিখেছিলেন তিনি



সংগৃহীত ছবি

শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে মুন্সীগঞ্জের মেঘনা নদী হতে প্রবীণ সাংবাদিক ও কলাম লেখক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ পুলিশ।পুলিশের ধারণা, তিনি নদীতে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

পরিবারের সদস্যরা জানান, ২১ আগস্ট সকালে অফিসে যাওয়ার কথা বলে তিনি বাসা থেকে বেরিয়ে যান।বাড়িতে না ফেরার কারণে রাতে থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন তারা। পরদিন বিকালে মেঘনা নদীতে তাঁর লাশ ভেসে ওঠে ।

এদিকে নিজের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি একটি দীর্ঘ লেখা পাঠান অনলাইন নিউজপোর্টাল বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে। শিরোনাম দেন—“খোলা চিঠি” এবং ফুটনোটে উল্লেখ করেন: “জীবনের শেষ লেখা হিসেবে এটা ছাপতে পারেন।”

নিচে বিভুরঞ্জন সরকারের সেই খোলা চিঠিটি হুবহু তুলে ধরা হলো—

" আমি বিভুরঞ্জন সরকার, ‘আজকের পত্রিকা’র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করি। সাংবাদিকতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক পাঁচ দশকের বেশি সময়ের। দেশের নানা পরিবর্তন, আন্দোলন, গণআন্দোলন এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছি। এই দীর্ঘ সময় আমি লিখেছি সত্যের পক্ষে, মানুষের পক্ষে, দেশের পক্ষে। কিন্তু আজ, যখন নিজের জীবনকে দেখি, অনুভব করি—সত্য লিখে বাঁচা সহজ নয়।

আমার পেশা আমাকে শিখিয়েছে—সত্য প্রকাশ করা মানে সাহসের সঙ্গে ঝুঁকি নেবার নাম। ছাত্রজীবনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে করতে শিখেছি, কখনো কখনো নাম গোপন রাখতেই হয়। সত্য প্রকাশ করতে গেলে জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলা প্রয়োজন হয়। এরশাদের আমল, নানা রাজনৈতিক আন্দোলন—সবক্ষেত্রে সাহস ছাড়া লেখা সম্ভব ছিল না। আমরা, আমার মতো সাংবাদিকরা, গোপন নাম ব্যবহার করেছি, তাতে স্বার্থের কিছু নেই, বরং নিরাপত্তার জন্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার অবস্থান স্পষ্ট ছিল—স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানো মানে দেশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। আমার এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে কোনো অবদান না রেখেও মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট বাগিয়ে সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন, নিচ্ছেন। আমি ও পথে হাঁটিনি।

স্কুল ছাত্র থাকতেই সাংবাদিকতার পেশায় জড়িয়েছি। দৈনিক আজাদের মফস্বল সাংবাদিক। স্কুলে পড়ার সময় আমাদের নামে আজাদে বড় বড় লেখা ছাপা হয়েছে। আবার বাম রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়াও সেই স্কুল থেকেই। রাজনৈতিক আদর্শবোধ ও সাংবাদিকতার নৈতিক সততা আমাকে ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য তাড়িত করেনি। একটাই তাড়না—দায়িত্ববোধ। আমি জ্ঞানত কখনো দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিনি। নিজের কাজে ফাঁকি দেইনি। খুব সাহসী মানুষ হয়তো আমি নই, কিন্তু চোখ রাঙিয়ে কেউ আমাকে দিয়ে কিছু লেখাতে পারিনি। অবশ্য বছর কয়েক আগে কথায় পটিয়ে আমাকে দিয়ে নাঈমুল ইসলাম খান তার স্ত্রী মন্টি আপার সুখ্যাতি লিখিয়ে নিয়েছিলেন!

আজকের সময়ে সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ অন্যরূপ। অনেকেই সুবিধা, স্বার্থ, সামাজিক মর্যাদা বা আর্থিক স্বার্থের জন্য সত্যকে আড়াল করে লেখেন। আমি নাম আড়াল করলেও সত্য গোপন করিনি। তাই হয়তো দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় এই পেশায় কাটিয়ে সম্মানজনক বেতন-ভাতা পাই না। এখন আমার যা বেতন তা বলে কাউকে বিব্রত করতে চাই না। তবে শুনেছি, আমার বিভাগীয় প্রধানের বেতন আমার প্রায় দ্বিগুণ। আহা, যদি ওই বেতনের একটি চাকরি পেতাম তাহলেও হয়তো সংসার চালানোর জন্য নিয়মিত ধার-দেনা করার পেশাটি আমাকে বেছে নিতে হতো না! অন্যসব খরচের হিসাব বাদ দিয়ে মাসে আমার একার ওষুধের ব্যয় ২০–২২ হাজার টাকা। বাড়িয়ে নয়, একটুবকমিয়েই হয়তো বললাম! আমার আর্থরাইটিস, লিভার সিরোসিস, ডায়াবেটিস, হৃদরোগসহ কত যে রোগ! আর্থরাইটিস ও লিভারের চিকিৎসার জন্য কত যে ধারদেনা করতে হয়েছে। আমার ছেলেও অসুস্থ, ওরও নিয়মিত চিকিৎসাব্যয় আছে। তাই ধার-দেনা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

শেখ হাসিনার শাসনামলে নানা পরিচয়ে অনেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন। একপর্যায়ে লাজলজ্জা ভুলে আমিও শেখ হাসিনার দরবারে সাহায্যের আবেদন করে কোনো ফল পাইনি। অনেক সাংবাদিক প্লট পেয়েছেন। আমি দুইবার আবেদন করেও সফল হইনি। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে বই লিখেও নাকি কতজন ভাগ্য বদলেছেন। অথচ আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত দুটি বইয়ের জন্য আমি দুই টাকাও রয়্যালিটি পাইনি। একেই বলে কপাল! তবে হ্যাঁ, একবার শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে সিঙ্গাপুর যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। ওই সফরের জন্য কিছু হাত খরচের টাকা আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা তো ওই কোটপ্যান্টজুতো কিনতেই শুধু শেষ হয়, আরও দেনা হয়েছে। ওই সুবাদে আমার কোট-টাই জুতা কেনা! সারাজীবন তো স্যান্ডেল পরেই কাটল।

শুধু মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে অবিচল অবস্থানের কারণে আমাকে আজও ‘আওয়ামী ট্যাগ’ দেওয়া হয়। কিন্তু আওয়ামী আমলেও কোনো বাস্তব পুরস্কার পাইনি। আমি পেলাম না একটি প্লট, না একটি ভালো চাকরি। বরং দীর্ঘ সময় চাকরিহীন থেকে ঋণের বোঝা বেড়েছে। স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে পরিবারের দায়বদ্ধতা আমাকে প্রতিনিয়ত চাপের মধ্যে রাখে।

‘আজকের পত্রিকা’য় কাজ করছি ৪ বছর হলো। এই সময়ে না হলো পদোন্নতি, না বাড়ল বেতন। অথচ জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে প্রতিদিন। সংবাদপত্র আর কীভাবে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে, ঘরের মধ্যেই যেখানে অনিয়ম।

সাপ্তাহিক ‘যায়যায়দিন’ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যাদের লেখার কারণে তাদের একজন তারিখ ইব্রাহিম। ওই নামে আমিই লিখতাম এরশাদের কোপানল থেকে রক্ষা পেতে। ক্ষমতা ছাড়ার পর দু-একবার দেখা হলে অবশ্য এরশাদও ‘দেশি’ হিসেবে আমাকে খাতির করেছেন।

আমি চাকরি করেছি দৈনিক সংবাদে, সাপ্তাহিক একতায়, দৈনিক রূপালীতে। নিজে সম্পাদনা করেছি সাপ্তাহিক ‘চলতিপত্র’। নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি ‘মৃদুভাষণ’ নামের সাপ্তাহিকে। ‘দৈনিক মাতৃভূমি’ নামের একটি দৈনিকের সম্পাদনার দায়িত্বও আমি পালন করেছি। দেশের প্রায় সবগুলো দৈনিক পত্রিকা এবং অনলাইনে আমার লেখা একসময় নিয়মিত

ছাপা হতো। দৈনিক 'জনকণ্ঠ' যখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তখন প্রথম পৃষ্ঠায় আমার লেখা মন্তব্য প্রতিবেদন ছাপা হতো।

অথচ এখন কোনো কোনো পত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে ছাপার জন্য অনুরোধ করেও ফল পাই না। আমার লেখা নাকি পাঠক আর সেভাবে 'খায়' না।

এক সময় কত খ্যাতিমান লোকেরা আমার লেখা পড়ে ফোন করে তারিফ করেছেন। অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যক্ষ সাইদুর রহমানের প্রশংসাও আমি পেয়েছি। রাজনীতিবিদ অলি আহাদ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, লেখক অধ্যাপক শওকত ওসমান, ড. রংগলাল সেন, অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের মতো কতজনের প্রশংসা পেয়েছি। বিএনপির এক সময়ের মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়াও আমাকে লেখার জন্য স্নেহ করতেন। ওহ হ্যাঁ, ড. মুহাম্মদ ইউনূসও অন্তত দুবার নিজে আমাকে ফোন করে আমার লেখার কথা বলেছেন। এখন অবশ্য এত সাধারণ বিষয় তার মনে থাকার কথা নয়। আজ আমার লেখা নাকি পাঠক টানে না। হতেই পারে, বয়সের ভারে বুঝি লেখা হালকা হয়ে গেছে।

নামে-বেনামে হাজার হাজার লেখা লিখেছি। সম্মানী কিন্তু পেয়েছি খুবই কম। কোনো কোনো পত্রিকা তো কয়েক বছর লেখার পরও একটা টাকা দেওয়ার গরজ বোধ করেনি। সেদিক থেকে অনলাইনগুলো অনেক ভালো। একটি বড় অনলাইনের কাছেও আমার মোটা টাকা এখনো পাওনা আছে।

অথচ এখন আমার দৈনন্দিন জীবন শুরু হয় ওষুধ খেয়ে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা দিয়ে এবং ওষুধ কেনার টাকার চিন্তায়।

এর মধ্যে গত বছর সরকার পরিবর্তনের পর গণমাধ্যমের অবস্থা আরও কাহিল হয়েছে। মন খুলে সমালোচনা করার কথা প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন। কিন্তু তার প্রেস বিভাগ তো মনখোলা নয়। মিডিয়ার যারা নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন তারা সবাই আতঙ্কে থাকেন সব সময়। কখন না কোন খবর বা লেখার জন্য ফোন আসে। তুলে নিতে হয় লেখা বা খবর! এর মধ্যে আমার একটি লেখার জন্য 'আজকের পত্রিকা'র অনলাইন বিভাগকে লালচোখ দেখানো হয়েছে। মাজহারুল ইসলাম বাবলার একটি লেখার জন্যও চোটপাট করা হয়েছে। আপত্তিকর কি লিখেছেন বাবলা? লিখেছেন, সেনাবাহিনী শেখ হাসিনাকে সামরিক হেলিকপ্টারে দিল্লি পাঠিয়েছে। আর শুধু পুলিশের গুলিতে নয়, মেটিকুলাস ডিজাইনের মাধ্যমে জঙ্গিরাও মানুষ হত্যা করেছে। এখানে অসত্য তথ্য কোথায়? শেখ হাসিনা কি হেলিকপ্টার ভাড়া করে গোপনে পালিয়েছেন? হাসিনার পুলিশ না হয় ছাত্র জনতাকে হত্যা করলো কিন্তু পুলিশ হত্যা করলো কে বা কারা? এইটুকু লেখার জন্য পত্রিকার বিরুদ্ধে তোপ দাগা একেবারেই অনুচিত।

সব মিলিয়ে পত্রিকায় আমার অবস্থা তাই খুবই নাজুক। সজ্জন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক চাপ সইতে না পেরে আমার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করেছেন।

আমি এখন কী করি? কোন পথে হাঁটি?

আমি লিখি, কারণ আমি জানতাম সাংবাদিকতা মানে সাহস। সত্য প্রকাশ মানে জীবনের ঝুঁকি নেয়ার নাম। দীর্ঘ পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা বলছে, সত্য লিখতে হলে কখনো কখনো ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে হয়। আমি তেমন স্বাচ্ছন্দ্য চাইনি কখনো। তবে সারাজীবন হাত পেতে চলতে হবে এটাও চাইনি।

আমার সাংবাদিক বন্ধু মাহবুব কামাল মনে করেন, আমার কোনো বড় ধরনের সমস্যা আছে। না হলে তিনি এখন অনেকটা নিরাপদ জীবন কাটালেও আমার অনিশ্চয়তা কেন দূর হলো না? আসলে তাই তো? আমার অভাব কেন দূর হয় না? মাহবুব ভাই শেখ হাসিনার কাছ থেকে জমি পেয়েছেন, চিকিৎসার জন্য দুই দফায় নগদ টাকাও পেয়েছেন। তারপর পৃথিবীজুড়ে তার অগণিত ভক্তকুল তাকে কত উপলক্ষেই না মুক্তহস্তে দান করেন। চিকিৎসার জন্য লাগবে লাখ কয়েক তিনি পেয়ে যান কোটি খানেক। আমার তো কপাল মন্দ। কোনো ভক্ত নেই। তবে আমিও একেবারে ঋণধার পাই না, সেটা বললে অসত্য বলা হবে। আমারও কিছু খুচরা দরদি আছে বলেই না এখনো বেঁচেবর্তে আছি।

আবার দেখুন, মাহবুব কামালের দুই পুত্র সন্তান। তারাও পিতার মতো সাফল্যের পরীক্ষায় পাস করে দেশে বিদেশে ভালো চাকরি করছে। আর আমার এক কন্যা ও এক পুত্র। ছাত্র হিসেবে মেধাবী কিন্তু...

এত এত মানুষ থাকতে মাহবুব কামালের কথাই কেন লিখছি? কারণ তার আজকের অবস্থানের পেছনে খুব সামান্য হলেও আমি ভূমিকা রেখেছিলাম! 'যায়যায়দিনে' কাজের জন্য পাটগ্রাম থেকে ঢাকা নিয়ে আসার জন্য শফিক রেহমানকে প্রভাবিত করেছিলাম। 'যায়যায়দিনে' লিখেই তো এখন বিশ্বসেরা সাংবাদিক।

আমি ক্ষুদ্র মানুষ। মনটাও সংকীর্ণ। সেজন্য আমার প্রতি সবাই বিদ্বেষ পোষণ করতেই পারে। আমি কিন্তু কারও প্রতি সামান্য বিদ্বিষ্ট নই। উপকার করার ক্ষমতা নেই বলে কারও অপকারের কথা স্বপ্নেও ভাবি না। নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমার ধারণা আছে। আমি যে খুব কম জানাবোঝা একজন মানুষ, সেটা আমি খুব ভালো জানি।

আমার সংসারে স্ত্রী ছাড়া দুই সন্তান। এক মেয়ে, এক ছেলে। ছেলেমেয়েরাও আমার মতো একটু বোকাসোকা। বর্তমান সময়ের সঙ্গে বেমানান। মেয়ে বড়। জীবনে কখনো কোনো পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেনি। ডাক্তার হয়েছে। বিসিএস পাস করে চাকরিও পেয়েছে। গ্যাসট্রোএনটোরোলোজিতে এমডি করতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে ধরা খেল। সরকার বদলের পর বিভাগীয় প্রধানের কোপানলে পড়ে আমার মেধাবী মেয়েটি থিসিস পরীক্ষায় অসফল হলো। অথচ ও কোনো রাজনীতির সাতে-পাঁচে নেই। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় অবশ্য পাস করেছে, এখন থিসিসের জন্য আবার অপেক্ষা। এর মধ্যে আবার কোন নিভৃত অঞ্চলে পোস্টিং দিয়ে দেবে, কে জানে!

আমার ছেলেটি বুয়েট থেকে এমএমইতে পাস করেছে। আমেরিকায় একটি বৃত্তি পেয়েও শারীরিক কিছু সমস্যার কারণে সময়মতো যেতে পারেনি। আমার ছেলেটি চার বছর বয়সে গুলেনবারি সিনডর্ম রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনমৃত্যুর সঙ্গে কয়েক মাস পাঞ্জা লড়ে তবে বেঁচেছে। ওর ব্যয়বহুল চিকিৎসার ধকল আমি সয়েছি। বুয়েট পাস হয়ে দেশে কত চাকরির পরীক্ষা দিয়ে পাস করেও এখন পর্যন্ত নিয়োগ নিশ্চিত হলো না। অপরাধ কি ওর নাম, নাকি বাবা হিসেবে আমি, বুঝতে পারছি না।

আমি কেন এই খোলা চিঠি লিখছি, সেটাও যে খুব ভালো বুঝতে পারছি তা নয়। তবে কয়দিন ধরে আমার কান কেন যেন কু ডাক শুনছে। মনটাও কেমন অস্থির অস্থির লাগছে। মাহবুব কামাল কিছু অর্থ সাহায্য করতে চেয়েও আমার কোনো ব্যবহারে কুপিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

শেষে 'প্রথম আলো' সম্পাদক মতিউর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছি না। আমি একতায় মতি ভাইয়ের সহযোগী ছিলাম। তিনিই আমাকে শফিক রেহমানকে বলে 'যায়যায়দিন'র সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন, বিশ্বাস করতেন। তার পত্রিকায় (তখন ভোরের কাগজ) আমাকে যোগ দিতে বলেছিলেন। আমার বাসায়ও এসেছিলেন। কিন্তু আমি তখন 'যায়যায়দিন' ছাড়তে চাইনি। জীবনে এর চেয়ে বড় ভুল আর আমার কোনোটা নয়। মতি ভাই, পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন।

আমার জীবনে কোনো সাফল্যের গল্প নেই। সাংবাদিক হিসেবেও এ-ডাল ও-ডাল করে কোনো শক্ত ডাল ধরতে পারিনি। আমার কোথাও না কোথাও বড় ঘাটতি আছে। এই ঘাটতি আর কাটিয়ে ওঠা হলো না।

দুঃখই হোক আমার জীবনের শেষ সঙ্গী। আর পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক।

তারিখ: ২১ অগাস্ট, ভোর ৫টা। সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা।"

সিনিয়র সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের এই মৃত্যু তে গভীর শোক জানিয়েছেন তাঁর সহকর্মীরা।তাদের ভাষ্যমতে এই খোলা চিঠি এখন বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বাস্তবতার এক মর্মস্পর্শী দলিল তার অভিজ্ঞতা ও বেদনার এই ভাষ্য পেশার সংকটকে নির্মমভাবে উন্মোচিত করেছে।